Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 201 – 209
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

দেশভাগের ফসল : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'

রুদ্রদেব মন্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ
Email ID : devrudra1991@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Barbed wire, Existence, Baseless two nation theory, Depreciating Society, Tragedy, Partition, Oleander tree, Gloominess,

Abstract

The race who fails to raise question for its existence are to face extinction. Questions set with high reason may overcome every Odds. Logic or reason is the sanctum sanctorum of questions as these Pave the path to freedom. Lack of reason has no road to freedom and this is an obstacle to freedom. A baseless two-nation theory bleeds the freedom of Bengalese by means of barbed wire. Any rootless nation thrives all its life upon the barbed wires to re- established their entity. Freedom brings eternal peace to any nation. But Bengalis received the agony of barbed wire boundaries for them. Such freedom is rarest of the rare in the world because for Bengalis, it actually brings barrier for their own fate as they got freedom void of reason. The political parties for their own interest satisfied the long cherished dream of the Britishers. To end the British Colonial hegemony, Bengalis themselves are stuck in the foul play of iron. The dangerous and beautiful. Experience of the Partition has been looted in the veins of Bengalis. The lack of visionary among the partition leaders and their love for power ruined common people. Deprived of the nectar of freedom, Bengalis lost their memory, entity and future. The result of freedom to them is like eating the oleander fruit. Freedom did not bring any positivity to them, rather dipped them in the eternal gloominess. Partition is a tragedy for Bengalis. The dangerous blow has ripped apart their entity and such feelings is expressive in literature too.

This question mark is the tag bearer of their entity. Literature is the junction where the present meets the past and shows the future. Partition has dipped us in the darkest gloominess and is reflected in several literature. Hasan Ajijul Haque is one of the Pioneers of such social depreciation whose short stories are full of emotions related to partition. His short story 'Daughter and an oleander tree' depicts the void of partition. To depict the pale and depreciating society and personal sacrifices he narrates his story.

On one night of darkness the writer exposed the wrong policies, secret history. Such secret stories get expressive in his latent thoughts. In the story we see a fox arises first with a hen in its mouth. That symbolic death is somewhere present in our future. The entire story is a symbolic gesture where a fox destroys human feelings, like the hen in the mouth of the fox. An old fathers pitiful

experience of selling her daughter's sanctity for thriving life is also expressed and he exposed the hollowness of the country. Such honourleft situation is the product of Partition.

Discussion

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে? কে বাঁচিতে চায়?"[১]

যে জাতি অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন তুলতে ভুলে গেছে, সেই জাতির অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখোমুখি। যুক্তিবাদী জাতি প্রশ্নের পাল খাড়া করেই আবহমান কাল ধরে বিবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি উত্তরিত হয়েছে। প্রশ্নের গর্ভগৃহ যুক্তি মনস্কতা। যেহেতু, যুক্তি প্রশ্নের জন্ম দেয়, আর প্রশ্নই মুক্তির প্রেক্ষাপট রচনা করে, সেহেতু যেখানে যুক্তি নেই, সেথায় মুক্তি নেই। যুক্তিহীনতাই মুক্তিপথের বাধা। ভিত্তিহীন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গেঁথে দেওয়া কাঁটাতারের কাঁটায় বাঙালির স্বাধীনতা রক্তাক্ত। ছিন্নমূল সত্তার শিকড় সন্ধানী জাতি আমৃত্যু আজীবন কাঁটাতারের তারকাঁটায় বিদ্ধ। স্বাধীনতা মানুষকে মুক্তি দেয়, বাঙালিকে দিয়েছে কাঁটাতারের সংকীর্ণ গন্ডি। এরকম স্বাধীনতা পৃথিবীর বুকে বিরল। বাঙালি জাতির মুক্তিই মুক্তিপথের বাধা। কারণ সেই মুক্তি যুক্তিহীন।

রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে বসে ইংরেজের বহু প্রাচীন স্বার্থকেই সিদ্ধিদান করে বসে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ জাতির দু'শ বছরের নির্যাতনের কাঁটা নির্মূলে বদ্ধপরিকর বাঙালি জাতি পুনরায় কাঁটাতারের তারেই আবদ্ধ হয়। বিভাজনের করুন ও ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে মূঢ় জাতির শিকড় উপড়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে কাঁটাতার। দেশভাগের ভাগ্য নির্ধারকদের দূরদর্শিতার অভাব এবং ক্ষমতায়নের লোভের শিকার সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার অমৃত লাভের সুযোগ বঞ্চিত জাতির স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ অবক্ষয়িত। স্বাধীনতার ফল তাদের কাছে করবি ফল ভক্ষণের মতই বিষাক্ত, যা ভক্ষণ মৃত্যুরই নামান্তর। স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের জীবনে কোন সদর্থকতা বয়ে আনতে পারেনি, বরং বাঙালিকে বেদনার সাগরে নিমজ্জিত করেছে। দেশভাগ বাঙালির জীবনের করুনতম ট্রাজেডি। দেশভাগের নিষ্ঠুরতম ছেদ বাঙালির যৌথ অস্তিত্বকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু সেই প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের মুখে প্রশ্ন যোগায় সাহিত্যই -

"তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর ওপর রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?"[২]

এই প্রশ্ন চিহ্ন আমাদের অস্তিত্বেরই চিহ্নায়ক। সাহিত্যই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থান নির্ণায়ক। দেশভাগের মত নিষ্ঠুরতম পরিণতি সাধারণ মানুষকে কোন অবক্ষয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে সেই অবক্ষয়েরও অন্যতম দর্পণ সাহিত্য। কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক সেই অবক্ষয়ের অন্যতম চিত্রকার। তাঁর 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ছোটগল্পে দেশভাগের অন্তঃসারশূন্যতার রূপ প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

বিংশ শতকে সংঘটিত দুটো বিশ্বযুদ্ধ ইহজাগতিক পৃথিবীর ক্ষয়-ক্ষতি প্রাণ-হানির পাশাপাশি মনোজাগতিক দুনিয়ায় ব্যাপকতর পরিবর্তন সহ মূল্যবোধের খোলনলচে উলটপালট করলেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথিবীকে দান করেছে ভিন্নতর সব তত্ত্ব। কিন্তু বাঙালির জীবনে দেশভাগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও সৃষ্টি করেছে এক গভীরতর ক্ষত, জন্ম দিয়েছে এক বৃহত্তম ট্রাজেডি।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ এইসব মিলিয়ে বাঙালির জীবনে গভীর সামাজিক ও ব্যক্তি সংকট তৈরি হয়। দেশভাগের ফলে উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু দিশেহারা বাঙালি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এই দেশবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাঙালির আভ্যন্তরীণ বিকার, ব্যাধি, অসঙ্গতি জটিলতা, এবং গলিত পচনশীল সমাজে ব্যক্তির অসহায়তা ও অস্তিত্বহীনতা থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও স্বপ্নভঙ্গের পরও নতুন স্বপ্নের বীজ বপনের

সৃষ্টিকর্তা হাসান আজিজুল হক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকলগ্নে জন্মগ্রহণকারী হাসান আজিজুল হকের সামগ্রিক জীবন জুড়েই যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রাধান্য লাভ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যে সময় ও সমাজে লেখক জীবন যাপন করেন সেই সমকালীন সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাকে তার রচনার মধ্যে উপস্থাপন করে সেই সময়ের ভোক্তা হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ঋণ পরিশোধ করে থাকেন লেখক। লেখকের এই দায়বোধ মানবজাতির কাছে, আরও বৃহৎ অর্থে আপন দেশ ও কালের কাছে। বিকারগ্রস্ত মানব অস্তিত্বকে সংগ্রামের কর্মযজ্ঞে শামিল করার হোতা লেখক নিজেই।

যে ভিত্তিহীন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙালির হৃদয়ে কাঁটাতার গেঁথে দেওয়া হয়েছে সেই কাঁটাতারের বেড়ায় বাঙালি জাতির ছিন্নমূল সত্তার শিকড় অনুসন্ধানের অন্যতম প্রাণপুরুষ হাসান আজিজুল হক। জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে তিনি উপলব্ধি করেছেন –

> "আমাদের সমাজের মধ্যে যে বিকট অমানবিকতা, পাকাপোক্ত নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিকতা আছে, স্যাঁতসেঁতে ভিজে হৃদয় নিয়ে তার সম্মুখীন হওয়া কোন লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়।"[৩]

এই অমানবিক সমাজব্যবস্থার মূলকে ছিন্ন করতে মানবিক লেখক হাসান আজিজুল হক নিষ্ঠুর শল্যচিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে সমাজ কাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন তা দিয়েই তিনি বহতা সময়ের দলিল তৈরি করেছেন। ব্যক্তি সত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বি-বাচনিকতা হাসানের কাছে অনুভবগম্য সত্য। এই সত্যের পৌনঃপুনিক উত্তরণই তার লেখার আধেয়।

জীবনে ও সাহিত্যে ব্যাপ্ত বিদূষন ও বিকারের স্বরূপ সন্ধানে তিনি উপলব্ধি করেছেন –

> "দেশ ডুবে থাকে অন্ধকারে, কাদায় পাঁকে; অন্য দিকে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে রাজধানী, পিচ ঢালা চওড়া রাস্তায় বিদেশ থেকে আমদানি করা গাড়ি উলঙ্গ মানুষের উপর আলো ফেলে নিঃশব্দে চলে যায়। বুদ্ধি নেই, মনন নেই, শিক্ষা নেই, বিবেচনা নেই, নির্মাণ ও সৃষ্টি নেই - আজ শুধু অবিরল বাক্যস্রোত। তাতে আর জীবন জাগে না, হাত কাজ খুঁজে পায় না, মস্তিষ্ক তোষামোদ আর উঞ্ছবৃত্তিতেই আপন ক্ষমতা ফুরিয়ে ফেলে। জনজীবনে আজ সুবিশাল চরা।"[৪]

সেই অন্ধকার পটভূমি তার গল্পের প্রেক্ষিত। সমাজ ও ব্যক্তি সত্তার এই উলঙ্গ নগ্ন রূপ দেখে লেখকের ধারণা "দেশের অবস্থা হচ্ছে গলায় গামছা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার মত।"[৫] একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে এরকম পরিস্থিতিতে সমাজের অন্ধকার দূরীকরণের দায়ভার বহনের ব্যর্থতা থেকে লেখকের মনে এক অপরাধবোধ জন্ম নেয় আর সেখান থেকেই লেখকের মনে হয়েছে –

> "লেখার আয়নায় আমার সময়কালের দেশ সমাজ পৃথিবীর বাস্তবতার কিছু মাত্র প্রতিফলন যদি ঘটাতে পারি, তাতে হয়তো এমন শক্তির উদ্বোধন ঘটবে যাতে শ্রম ও উৎপাদনের ফলের মত কোন প্রত্যক্ষ ফল ফিরিয়ে দিতে না পারার সংকোচও খানিকটা কেটে যাবে।"[৬]

সেই সংকোচ নিবারণের, অন্ধকার দূরীকরণের উপায় হচ্ছে সাহিত্য। কারণ সাহিত্যিকের হাতের অস্ত্রটি সবচেয়ে জোরালো। সেই অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগে মানব জীবনকে ফালাফালা করে তার প্রত্যেকটি শিরা উপশিরার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি মেলে ধরতে পারেন। আবার সেই অস্ত্রেরই নিখুঁত ছোঁয়ায় তিনি মানবসত্তার পূর্ণ বাস্তবতার অবয়ব স্পষ্ট রেখায় এঁকে দিতে পারেন। তাই সাহিত্যেই জীবনের সামগ্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয়।

> "স্পষ্টতর ছবি আঁকায় বড় কথা নয় খবরের কাগজেও জীবনের ছবি পাওয়া যায় বৈকি, সাহিত্যিকের কাজ আরেকটু বেশি।"[৭]

সেই অঙ্গীকারবদ্ধতার ফলস্বরূপ তার সাহিত্যে পদার্পণ।

ক্ষয়িষ্ণু, বিবর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় পচনশীল ব্যক্তি সত্তার স্বরূপকে রূপ দিতে গিয়ে কথাকার হাসান আজিজুল হক জানিয়েছেন–

> "বিশ্লেষণ ছাড়া যে পূর্ণের স্বরূপ মেলে না, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য যে জীবন যাপনের মূলে প্রোথিত, গতি ও স্থিতি যে সমাজের কাঠামোয়, আর মানুষের স্বভাবে মৈত্রী ও সংগ্রামের প্রবণতা যে ক্রমান্বয়ে বদলিয়ে চলে এবং সাহিত্য মানেই যে কৌশলে মানুষকে হাজির করা নয় বরং জীবনের জটিল কুটিল অষ্টাবক্র স্বরূপকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা–"[৮]

জীবনের জটিল কুটিল অষ্টাবক্র স্বরূপ তুলে ধরার জন্য মধ্যবিত্ত বর্গ যে একমাত্র আশ্রয় ভূমি নয়, হাসানের গল্পবিশ্ব তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাঙালি সমাজের অন্ধকার ও ধূসর নিচু তলায় জীবন যাপনের যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য, গতি ও স্থিতি রয়েছে তার বিচিত্র অনুপুঙ্খ গ্রন্থনার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে তিনি বাস্তবের ভেতরকার টানা পোড়েনকে গল্পের আধেয়তে রূপান্তরিত করেছেন। অনিকেত মানুষের তীব্র দহন তাঁর 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান।

দু পাশের বনবাদাড় আর ভাঙ্গা বাড়ির ইটের স্তূপ থেকে মুমূর্ষ মুরগি মুখে নিয়ে নেকড়ের মতো ছায়া ফেলে গল্পের মঞ্চে আবির্ভূত শিয়াল সমগ্র গল্পের পটভূমি রচনা করে। ভাঙ্গা বাড়ির ইটের স্তূপ দেশভাগের পর অস্তিত্বহীনতার সাক্ষ্য বহন করে এবং সেই প্রেক্ষাপটে নেকড়ের মতো ছায়া ফেলে শিয়ালের আবির্ভাব কিছু ধূর্ত হিংস্র অস্তিত্বের বাহক। তারপরেই গল্পের মঞ্চে ঈশান কোণ থেকে (অধিষ্ঠিত দেবতা শিব) আবির্ভাব ঘটে প্রান্তিক বর্গের প্রতিনিধি দল চাঁদমনির বাড়ির লোকের; যারা শিয়ালের ধূর্ততার শিকার। লাঠি হাতে হল্লা করে ফেরে তারা, হল্লাই তাদের সার হয়, শিয়ালের টিকি মেলে না। অধরা স্বপ্নের অন্তহীন সন্ধান করে ফেরে তারা। সেই মুমূর্ষু মুরগির ধ্বংসস্তূপ আগামীতে কোন ধ্বংসস্তূপেই মিলবে এই ইঙ্গিত দিয়েই গল্পের সূচনা করে গল্পকার ব্যঞ্জনার মোড়কে সমগ্র গল্পের প্রেক্ষাপট প্রথম পরিচ্ছেদেই সুকৌশলে উন্মোচন করেছেন।

তিন যুবকের অন্ধকারের গভীরে গোপনে কামলিপ্সা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে অভিসার যাত্রা গল্পের যাত্রা পথ নির্ধারণ করে। সেই পথ ধরে কিছু দূর অগ্রসর হবার পর কামলিপ্সা চরিতার্থতার জন্য বড় ভাইয়ের পকেট মারতে দ্বিধাহীন যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র পাঠককে বিস্মিত করে। বিস্ময় আচ্ছন্ন হয়েই পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে পাঠক বেদনা মথিত হৃদয় নিয়ে হাহাকার করে ফেরে। আর ইনামের কণ্ঠস্বর কর্ণতলে গুঞ্জরিত হয় - "এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ?"[৯] এক বৃদ্ধ পিতার জীবন নির্ধারণের উপায় হিসেবে নিজ কন্যার দেহ বিক্রির ছবি আমাদের সমাজের অন্তর্মূলে গিয়ে আঘাত করে। রাতের গভীরে গোপনে মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিসরে সংঘটিত ঘটনার অন্তরালে রয়েছে অতল ব্যাপ্তি।

গল্পের প্রারম্ভেই আমরা ইনামকে দেখি পুলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজ অস্তিত্বের অনুসন্ধানে মগ্ন। পানির রুপোলি মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক মুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ বিভাগ সমাজ জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষত মানুষের অস্তিত্ব, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটায়। সমগ্র গল্প জুড়েই এই বিশ্বাসহীনতা, অস্তিত্বহীনতার ছবি চোখে পড়ে। এই বিশ্বাসহীনতা কেবল নিজের প্রতি নয় দেশের প্রতি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ইনাম নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তার বক্তব্যেই তা পরিষ্কার –

> "পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক... চাকরি গাছে ফলতিছে।"[১০]

মূল্যবোধের জাগরণ ঘটায় যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসচ্যুত ইনাম তাই আজ জীবিকা নির্ধারণের উপায় হিসেবে পকেটমারাকে বেছে নিয়েছে। কারণ, "ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড় কষ্ট।"[১১] সেই কষ্ট নিবারণের কোন উপায় তাদের সামনে খোলা নেই। তাই বাঘের মত শরীর নিয়েও সুহাস কর্মহীন।

সৌন্দর্য চেতনার অপমৃত্যু ঘটিয়ে গল্পের মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে ফেকুর। "কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু।"[১২] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যচেতনাও তার কাছে বিস্বাদ লাগে। আসলে এই দৃশ্যের মাধ্যমে লেখক এক অস্থির যুগ

প্রেক্ষাপটকেই রূপায়িত করেছেন। চল্লিশের দশক বাংলাদেশ ও বাঙালির কাছে এক সংকটের কাল, অস্থিরতার কাল। এই সংকটময় অস্থিরতার শিকার ফেকু। যুগ প্রেক্ষাপটের শিকার নীতিভ্রষ্ট ফেকুর - "করবটা কি কতি পারিস?"[১৩] এই জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠক মনে অনেক কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায় এবং এর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থাকে অনেক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সমাজের প্রতি বিগতস্পৃহ যুবক ফেকু যখন দিশেহারা হয়ে খুঁজে ফেরে "কেন তার জীবন নষ্ট হলো, কে কে নষ্ট করল।"[১৪] তখন পাঠকও মরিয়া হয়ে সেই ভ্রান্তনীতির চোরা গলির অনুসন্ধানে মগ্ন হয়। কে বা কারা তার জীবন নষ্ট করেছে এবং সমাজের কোন কলুষতার শিকার হয়েছে ফেকুর জীবন, গল্পকার পাঠকের সামনে তার পটচিত্র তুলে না ধরলেও ফেকুর বয়ানে –

"জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি, কি কলাডা করবানে?"[১৫]

ফেকুর এই জিজ্ঞাসা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বড় জিজ্ঞাসা। লেখক এই একটি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পাঠক মনের অনেক প্রশ্নের কৌতুহল মিটিয়েও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে অনেক গোপন ইতিহাসকেই উন্মোচন করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে ঔপনিবেশিক শক্তির থাবা আমাদের পেটে আঘাত হানে, আর রক্তক্ষরণ শুরু হয় হৃদয়ে। অখন্ডিত এই ভূখণ্ডের খন্ডীকরণের প্রথম সাইরেন সংকেত বেজে ওঠে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে। ভূমির ওপর বিদেশি শক্তির প্রবল থাবা ভূমি ও ভূস্বামী উভয়কেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশীয় মানুষের ঐতিহাসিক ভিত্তি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি, নিজ স্বার্থ চরিতার্থতায়। তাদের স্বার্থ হীনতাই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট রচনা করে এবং ইতিহাসের পরিহাসে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও আবার সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ওই উপনিবেশিক শক্তি (পশ্চিম পাকিস্তান) পূর্ববঙ্গের মানুষের ঐতিহাসিক ভিত্তি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মাঝের ইতিহাসটুকু পর্যালোচনা করেই আমরা দেখব দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা আলাদা রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান কতটা ভিত্তিহীন, কতটা যুক্তিহীন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব বা দেওয়ানি লাভের অধিকার পেলেও কোম্পানির উপযুক্ত কর্মচারী এবং রেকর্ড বা কাগজপত্রের অভাবে লর্ড ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করে নায়েব নাজিম রেজা খানকে। এদিকে বিচারব্যবস্থা পরিচালনার মতো অর্থবল ও লোকবল না থাকায় নবাব ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পালন করে চলে, আর কোম্পানি ভোগ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। ফলে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা দ্রুত ভেঙে পড়ে, নবাব সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন, কোম্পানির পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু কোম্পানি এই ক্ষমতা বাদশাহের ফরমানে লাভ করেছেন সেটাই উপস্থাপন করে কৌশলী ক্লাইভ। আরও পরবর্তীকালে কর্নওয়ালিস কৌশলী প্রক্রিয়াকরণকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয় ভূমি রাজস্বের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে। জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি কর্নওয়ালিস এ দেশী জমিদারদের পছন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও খাজনা আদায়ের দায়িত্ব জমিদার শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত করার পিছনে কতগুলো কৌশলগত কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, কৃষকের কাছে থেকে খাজনা আদায়ের জন্য একটি বিরাট প্রশাসনিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল; যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। অপর কারণটি আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত, খাজনা আদায়ের দায়িত্ব জমিদার শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত হলে একটি স্থানীয় শক্তিশালী শ্রেণীর আনুগত্য লাভ করবে কোম্পানি। বঙ্গে অবস্থানকারী অধিকাংশ মুসলমান প্রজার রাজস্ব আদায়ের জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর জমিদার শ্রেণীকেই প্রতিস্থাপন করা হয়। পূর্বেকার মুসলমান তুর্কি আফগান শ্রেণীর জমিদার গোষ্ঠীর পরিবর্তে ইংরেজদের সঙ্গে যাদের দালালভিত্তিক সুসম্পর্ক, সেই নব্য মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে। অতএব অবধারিতভাবে অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এই পরিসরে, যা সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা। পুরনো প্রতিষ্ঠিত জমিদার ও নব্য এলিট সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে। যার মূলে ছিল অর্থনীতি। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পুরনো জমিদার শ্রেণী বিদ্রোহ করে। মুসলমান প্রজাকুল তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু দরিদ্র হিন্দু কৃষক সমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকে, কারণ তাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি ছিল সুবিধার স্থানে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর এই ছবি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে পূর্বেকার ওপরতলা বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় পুরনো মোঘল ও মুসলমানপন্থীদের জন্য দরজা খুলে যায়। বাংলার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের ওপরতলা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। দীর্ঘদিন হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপরতলাকে সুবিধা দেওয়ার পর মুসলমান ওপরতলাকে সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় উপনিবেশের স্বার্থে। শুরু হয় দালালি প্রতিযোগিতার যুগ। এই দালালি ও দালাল হওয়ার প্রতিযোগিতা ক্রমে রাজনীতিতে বড় বিষয়ে পরিণত হয়। ক্রমে নব্য মুসলমান এলিট ও বাংলার নব্য এলিট সম্প্রদায়ের সমঝোতায় যৌথ আন্দোলনের সূচনা হয় দুটি কেন্দ্রেই। কিন্তু এই এলিট সম্প্রদায়ের আন্দোলন কৃষক পন্থী ছিল না। এরা ছিল এলিট রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী, নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধার স্বার্থে। অপরদিকে এই দালালি প্রতিযোগিতা থেকে দূরে ছিল কৃষক সমাজ। কারণ, কাঠামোগতভাবে তার কাছে ঔপনিবেশিক সুবিধা দেওয়া বা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই কৃষক সমাজ হয়ে ওঠে প্রধান প্রতিরোধী। যখন উত্তর ভারতের রাজনীতি প্রায় সবটাই এলিট দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক, তখন বাংলায় কৃষক সম্প্রদায়ই প্রধান প্রতিরোধী। সুতরাং বোঝা যায়, উত্তর ভারতের ইতিহাস ও বাংলার ইতিহাস এক ছিল না। একটির লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার, অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি। বঙ্গে এই বিদ্রোহী কৃষক শ্রেণি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ কৃষক সমাজের ধর্ম পরিচয় তার অর্থনৈতিক পরিচয় থেকে বড় ছিল না। আন্ত শ্রেণি মোর্চা ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কারণ এগুলি গঠিত হতো আর্থসামাজিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। সাংস্কৃতিক, ভাষা বা ধর্মভিত্তিক মোর্চা কখনোই সফলতা লাভ করেনি। ধর্মীয় পরিচয় ইন্ডিয়া নামক অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করলেও বিশ্বের সকল ইতিহাসের মতো এর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাই ছিল প্রধান।

এমতাবস্থায় বাংলার উগ্র জাতীয়তাবাদকে দমন করতে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে কার্জনের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ছিল কংগ্রেসকে দুর্বল করা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তোলা। ১৮৫৭ 'র পর মুসলমানদের নেতৃত্বে যেসব দালালি আগ্রহী প্রতিষ্ঠান জন্মায় তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। জন্ম লাভ করে মুসলিম লীগ। কার্জনের দূরভিসন্ধি কৃষক সম্প্রদায়কে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন থেকে দূরে রাখে। কলকাতার ক্ষতিগ্রস্ত এলিটরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল চাপ সৃষ্টি করে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। ঠিক যে কারণে প্রান্তিক গোষ্ঠী দাবি করেছিল সেই একই কারণে কেন্দ্রের গোষ্ঠী প্রতিবাদ করেছিল বঙ্গভঙ্গের। দ্বন্দ্বটি সাংস্কৃতিক ছিল না, ছিল রুটি রুজির অর্থাৎ অর্থনৈতিক। পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক মানুষের আর্থ সামাজিক যে বাস্তবতা ছিল তার সাথে যুক্ত হয় ভুমি বা সীমান্তের জনকল্পনা। সেই কারণে বঙ্গভঙ্গ গঠন ও রদ করার আন্দোলন প্রকৃত অর্থে হয়ে ওঠে উপরাষ্ট্র গঠন পর্যায় যা পরে রাষ্ট্র গঠন আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলন পরবর্তী রাজনীতিতে ১৯৩৬ থেকে ৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রজন্মকালীন ঘটনাসমূহে বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই সময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে প্রান্তিক ভোটারের শক্তি প্রয়োগে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন পার্টি (KPP) চেয়েছিল বঙ্গীয় কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধে সরকার গঠন করতে। যেহেতু কংগ্রেসের মাথাব্যথা ছিল কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ে, আর এটি ছিল স্থানীয় বিষয়, তাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের এতে কোন আগ্রহ ছিল না। এর পিছনেও নাকি মুসলিম লীগেরই মাথা ছিল। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে জোট বেঁধে সরকার গঠন করে। উত্তর ভারত বঙ্গের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করে।

রাষ্ট্রভাবনা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত হয়। এর একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকে হঠাৎ করে হয় না। এই স্বাধীন রাষ্ট্রভাবনার ইতিহাস কত দূরে সেটা অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য। তবে জনগোষ্ঠীর যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে নিজস্বতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় ইংরেজ আসার পর বিদ্রোহের মাধ্যমে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবেই পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্রের আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব ও উত্তর ভারতের দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে 'ইস্ট পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি' জাতীয় সংস্থাগুলি আলোচনা করে। তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের তা নিয়ে কোন উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি। কিন্তু 1946 সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় একক পাকিস্তানের কথা বলেন জিন্নাহ। তখন এর প্রতিবাদ করেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ

সম্পাদক আবুল হাসেম। জিন্নাহ যখন কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন প্রস্তাবনা বিষয়ক দলিলের বই দেখা হয়। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল 'states' অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র নয়। জিন্নাহ এটিকে টাইপিং ভুল বলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নতুন ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যেটিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তার পক্ষেই ভোট দেন। এইটাই স্বাভাবিক ছিল যেহেতু জিন্নাহপন্থীরা দল নিয়ন্ত্রণ করত। এই ভাবে দিল্লিতে এসে লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করা হয়। দিল্লি থেকে ফিরে আবুল হাশেম বঙ্গীয় কংগ্রেসের সাথে সংযোগের ফলে যৌথ বাংলা বা সকল বাঙ্গালীর জন্য একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস এতে আগ্রহী হলেও পুনরায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। নব্য রাষ্ট্রের বিষয় প্রস্তাবিত হলেও তখন একক বাংলা বলে আর কোন ধারনা ছিল না। সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আর্থসামাজিক ইতিহাসের গতিধারা তখন আর এক নয়, ঐতিহাসিকভাবে এর কোন ধারাবাহিক উপস্থিতিও অনুপস্থিত।

আসলে ১৯০৫ সালে যে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটি প্রান্তিকতার সূচক ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়, সেটা ক্রমেই রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। একটি উপরাষ্ট্রের যে পরিচিতি তার পক্ষে পূর্ণরাষ্ট্র পরিচিতি ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব ১৯৪০ এর প্রস্তাব বাস্তবায়নের ভিত্তি ছিল। কিন্তু যৌথ বাংলার আকর্ষণ থাকলেও এটার বাস্তব ভিত্তি ছিল দুর্বল। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের দিল্লির প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনস্থ হয়। অথচ বঙ্গীয় প্রান্তিক শ্রেণী কারো অধীনস্থ হওয়ায় আগ্রহী ছিল না, হওয়ার কথাও নয়। বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিদ্রোহের ইতিহাস অর্জন বাদ দিয়ে উত্তর ভারতের অধীনস্থ সংখ্যালঘুদের পরিচালিত রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চাইবে কেন? তার কোন যুক্তি নেই, তার কোন ভিত্তি নেই। কেবল একটাই ভিত্তি দ্বি-জাতিতত্ত্ব; যা ভিত্তিহীন। বঙ্গের দখলদার উত্তর ভারতের এলিট সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাষ্ট্র চেতনাকে ধ্বংস করেছিল। অতএব পাকিস্তানের যে অভ্যন্তরীণ সংকট সেটার সূত্র রাষ্ট্রচরিত্র। যেহেতু দুটি অংশ মিলে একক রাষ্ট্র ছিল না, বরং একটি রাষ্ট্র জোর করে অন্যটিকে কব্জা করে রেখেছিল তাই বৈষম্য নীতিটাই ছিল স্বাভাবিক। রাজনৈতিক নেতারাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে বসে ইংরেজের বহু প্রাচীন স্বার্থকেই সিদ্ধিদান করে বসে। ওই ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে বঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিক ভিত্তি অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। অতএব বঙ্গের প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে শুধু কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়।

এই হচ্ছে গল্পের পটভূমি। দেশভাগের অভ্যন্তরীণ সংকটের শিকার সাধারণ মানুষ বৃদ্ধ পিতার চোখের সামনে তার কন্যার সম্ভ্রম লুট করেছে রাষ্ট্র। এক কিশোরীকে কচি ডাবের মত শরীর বিক্রি করে বৃদ্ধ পিতার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছে রাষ্ট্র। যুবক সম্প্রদায়ের নীতিভ্রষ্ট চরিত্রের পিছনে কাজ করেছে রাষ্ট্রচরিত্র। সমাজব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফেকুর "উঁচো জায়গায় দাঁড়োয়ে সবির উপর পেচ্ছাপ"[১৬] আসলে ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতির মুখেই...। একটি সুষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই বাক্য কখনোই কাঙ্খিত নয়। মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফেকুর কপালের ক্ষতের মতোই সেই ক্ষত পরিদর্শন করি যা নিরাময়ের কোন রাস্তা ফেকুদের জানা নেই, কারণ সেটা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট। প্রেক্ষাপট ও ফলাফল উভয়ই। সেই প্রেক্ষাপটেরই শিকার সবাই, তাই সবাই দিকভ্রষ্ট। সবাই সবাইকে হত্যা করতে চায়। এমনকি চাঁদমনির বাড়ির বুড়ি মায়ের মৃত্যু কামনা করে নিজের ছেলে "মরে যাচ্ছে না ক্যানো কেডা জানে।"[১৭] তখন মনে হয় সামাজিক স্নেহ ভালবাসার বন্ধন প্রীতি বলে কিছুই নেই, আছে শুধু নিদারুণ অভিঘাত। "হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না"। এ যেন এক আশ্চর্য চিত্রকল্প। এরপরই লেখক সুকৌশলে জানিয়ে দেন –

> "এই রকম জীবন চলতে থাকে। ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টারের চাবিটা ঘট করে খুলেই বন্ধ করে, ইনাম মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে।"[১৮]

চলমান জীবনের এই নিরন্তর প্রবাহিত বেদনার মুক্তি নেই।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাসের সাক্ষী হতে হয়েছিল অজস্র মানুষকে। দেশটাকে পণ্য হিসাবে কেনাবেচা, ভাগাভাগির মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকেই। দেশভাগের মর্মন্তুদ পরিণতি ভাগাভাগি হয়েছে সাধারণ মানুষের

মধ্যেই। তাই স্বাধীনতার অমৃত লাভের সুযোগ বঞ্চিত জাতির প্রাঙ্গণে করবী গাছ বিদ্যমান। অথচ সমুদ্রমন্থনের সূচনা ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার জন্মদাতা এই সাধারণ মানুষ। অথচ মুহূর্তের পরিসরে সংঘটিত এই গল্পের অন্তরালে রয়েছে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপ্তি। তাইতো বৃদ্ধ যখন বলেছে "দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।"[১৯] তখনই স্পষ্ট তার অন্তরের চেতনা বিবেক সব ধ্বংস। তাইতো নিজের কন্যার ইজ্জত বিক্রির পয়সায় সে জীবন ধারণ করে আর নিজেকে মানসিক সান্তনা দেয় ওরা শুধু গল্প করবে।

"যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে।"[২০]

বৃদ্ধ পিতার বেঁচে থাকার সম্বল কন্যার সম্ভ্রম। কন্যার দেহ বিক্রির পয়সায় জীবনধারণ করবী ফলের মতই বিষভক্ষণ। করবী ফলের বিষক্রিয়া সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে। তারই পরিনাম নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়, যার পশ্চাতে রয়েছে রাজনৈতিক অবক্ষয়। রাজনৈতিক নেতাদের চেতনার অভাবের বলি রুকুর মত শত শত কিশোরী। রুকুর সম্ভ্রম বিক্রি করেছে রাষ্ট্র, সম্ভ্রম লুটছেও রাষ্ট্র। বৃদ্ধ পিতাকে নিজ কন্যার কচি ডাবের মত শরীর বিক্রি করতে বাধ্য করেছে রাষ্ট্র; তা বৃদ্ধের কথাই সুস্পষ্ট –

"তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জঙ্গুলে জায়গায়... বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম – ওসব তোমরা জানো, আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের।"[২১]

ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের স্বার্থে পূর্ববঙ্গের মানুষের ঐতিহাসিক ভিত্তি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। তাইতো আজ বৃদ্ধ পিতাকে নিজের কন্যার দেহ বিক্রির পয়সার জীবন ধারণ করতে হয়। এর মত নির্মম বেদনা পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এই নির্মম বেদনার সাক্ষী লেখক নিজে। শাহাদুজ্জামানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছে'র ঐ বৃদ্ধদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত জীবন আমি দেখেছি। লেখকের এই দৃষ্টির হাত ধরেই আমরা প্রাঙ্গণের সেই করবী তলায় উপনীত হয়, আর ভক্ষণ করি সেই করবী ফল, যার বিষ অন্তরের মর্মমূলে ক্রিয়া করে আমাদেরকে অন্তরে শুকিয়ে মারে। অস্তিত্ব সংকট দেখা যায়। লেখক বলেছেন–

"ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই।"[২২]

ছায়া তো শরীরের প্রতিমূর্তি। ছায়ার অবয়ব কায়াকে আশ্রয় করেই বাড়ে কমে, তার হ্রাস বৃদ্ধিতে মানব শরীর ভূমিকাহীন, তার জন্ম মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে আলোকরশ্মি। এখানে বৃদ্ধের জীবন রাষ্ট্র চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। খড়কুটোর মত ভাসমান জীবনের শেষ সম্বল আত্মজার দেহ। কোথা থেকে কে তার জীবন ভাসিয়ে নিয়ে এলো, কোথায় বা তার কূলকিনারা? তার সন্ধান বৃদ্ধ জানে না। শিকড় ছেড়া ছিন্নমূল সত্তা তাই "পানিতে ডুবে যেতে ভেসে যেতে থাকলো।"[২৩] পানিতে ডুবে যেতে যেতে ভেসে যেতে যেতে চোখের সামনে ভেসে ওঠা গোপন ইতিহাস আমাদের বাকরুদ্ধ করে। লেখক তাই বলেছেন– "শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে।"[২৪] আসলে এই শ্লেষ্মা শুধু বৃদ্ধের বুকেই জমে নি। লেখক নির্মিত বেদনার এই নির্মম দৃষ্টান্তে আমরাও নির্বাক। এই বেদনার ভার মুক্তি নেই। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ইনামের কণ্ঠস্বর কর্মতলে গুঞ্জরিত হয়-

"এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ?"[২৫]

নিরন্তর প্রবাহিত এই কান্নার দায়ভার কে নেবে?

Reference :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পদ্মিনী উপাখ্যান, ১১৫/২ নং স্ট্রীট, নূতন কলিকাতা, ১৩১২ সাল, পৃ. ৭৪
২. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়া সমগ্র, বাণীশিল্প, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি 1985, পৃ. ৩৬
৩. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১২

৪. তদেব, পৃ. ১৫

৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃ. ৪০

৬. তদেব, পৃ. ৩৯

৭. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১২

৮. তদেব, পৃ. ১৩

৯. হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১১৫

১০. তদেব, পৃ. ১১০

১১. তদেব, পৃ. ১১২

১২. তদেব, পৃ. ১১০

১৩. তদেব, পৃ. ১১২

১৪. তদেব, পৃ. ১১২

১৫. তদেব, পৃ. ১১২

১৬. তদেব, পৃ. ১১২

১৭. তদেব, পৃ. ১১১

১৮. তদেব, পৃ. ১১১

১৯. তদেব, পৃ. ১১৪

২০. তদেব, পৃ. ১১৫

২১. তদেব, পৃ. ১১৪

২২. তদেব, পৃ. ১১৫

২৩. তদেব, পৃ. ১১৫

২৪. তদেব, পৃ. ১১৫

২৫. তদেব, পৃ. ১১৫

Bibliography :

হক, হাসান আজিজুল, *গল্পসমগ্র ১,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৮